জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০২০

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বরিশাল : ১৯০৫-১৯২৩

মোহাম্মদ আবদুল বাতেন চৌধুরী*

Abstract

The logical analysis is to be explicated, about the roles of Barishal contributed to the endeavor of all the parts of Indian sub-continent achieving complete freedom from British rule in 1905 to1923, in this article. Swadeshi and boycott movement were cropped up protesting the Bengal Partition in 1905. These movements have developed into a demonstration of applying own capabilities and strength being vigilant about it abstaining from previous dialogue system against the occupying force. Revolutionary movement has been set out subsequently. Combined movement of Hindus and Muslims against British imperialist power springs up through Khilafat and Non-co-operation movement. Barishal has partook in every movement sprightly. Historical consequences and logical analysis evince that the contribution of Barishal in Anti-British movement was epistemological, intellectual and pragmatic that accelerated the independence of Indian sub-continent.

ভূমিকা

১৯০৫ থেকে ১৯২৩ কালপর্ব ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একদিকে যেমন শুরু হয় স্বদেশি গ্রহণ ও বিলেতি পণ্য বর্জনের আন্দোলন অন্যদিকে শুরু হয় সরকারের দমন পীড়নের প্রতিবাদে সহিংস বিপ্লবী আন্দোলন। তাই এ সময়কালকে ভারতের জাতীয় আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তির প্রয়োগের সময় হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। উক্ত সময়কালে ব্রিটিশবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে বরিশাল জেলার অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। এ সময়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কখনও বরিশাল জেলা নেতৃত্ব প্রদান করে, আবার কখনও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সমহারে অংশগ্রহণ করে। বরিশাল জেলার জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বরিশালে তাঁর-ই নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়। স্বদেশি আন্দোলনের ব্যাপকতায় ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন। এ সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদরা বরিশালে আসেন। স্বদেশি আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত বরিশাল জেলাতেও শুরু হয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন। বিশেষ করে স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বরিশালে অনুশীলন সমিতির শাখা এবং বরিশাল দল নামে ব্রিটিশবিরোধী দুটি গোপন সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বরিশালের গ্রামেগঞ্জে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধান্তে ১৯২০ সালের পর বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী দলগুলো একত্র হয়ে দলের নামকরণ করে যুগান্তর দল। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সাময়িক ঐক্য তৈরি হয় তার প্রভাব বরিশাল জেলাতেও দেখা যায়। তবে ১৯২৩ সালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের মৃত্যুর পর বরিশালের রাজনীতিতে বিরাজমান অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের অনেকাংশেই ছন্দপতন ঘটে। বর্তমান প্রবন্ধে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বদেশি আন্দোলন, স্বদেশবান্ধব সমিতি গঠন, ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, স্টিমার ধর্মঘট ও লবণ আন্দোলনের প্রভাব বরিশাল জেলাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এতদ্‌প্রেক্ষিতে বরিশালের রাজনীতি কিভাবে পরিচালিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করা হবে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল

গবেষণা পদ্ধতি

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বরিশাল জেলার অংশগ্রহণ প্রণিধানযোগ্য হলেও এ বিষয়ে গবেষণার পরিমান খুবই কম। তাই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বরিশাল জেলার নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিরূপণ করা এবং এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়ার চিত্র তুলে ধরা বর্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটিতে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ব্রিটিশবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম সংক্রান্ত প্রকাশিত পুস্তক, জার্নাল, সাময়িকপত্র, প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, সংকলিত পুস্তক, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি হতে যাচাই-বাছাই, আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে বর্তমান প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে।

স্বদেশি আন্দোলন ও স্বদেশবান্ধব সমিতি

বরিশাল ছিল বঙ্গভঙ্গ[১] বিরোধী আন্দোলনের একটি অন্যতম ক্ষেত্র। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালে স্বদেশি আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই তাঁর-ই নির্দেশে *বরিশাল হিতৈষী* পত্রিকা বিলেতি দ্রব্য বর্জনের জন্য জনগণকে আহ্বান করে। এ বিলেতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনই ক্রমে স্বদেশি আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯০৬ সালের ৬ আগস্ট বরিশালে নেতৃসংঘ ও কর্মিসংঘ একত্রিত হয়ে গঠিত হয় স্বদেশবান্ধব সমিতি।[২] মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন স্বদেশবান্ধব সমিতির সভাপতি। বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশি আন্দোলন পরিচালনাকল্পে অশ্বিনী কুমার দত্ত স্বদেশবান্ধব সমিতি গঠন করে জেলার বিশেষ বিশেষ গ্রামে সমিতির মোট ১৫৯টি শাখা স্থাপন করেন। স্বদেশবান্ধব সমিতি গঠিত হলে ডাক্তার নিশিকান্ত বসু স্বেচ্ছায় স্বদেশবান্ধব সমিতির প্রচারক পদ গ্রহণ করেন। তিনি সমিতিতে দুজন হিন্দু ও দুজন মুসলমান প্রচারক নিয়োগ দেন। প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে সভা করে জনগণকে স্বদেশির বাণী শুনাতে থাকল। অশ্বিনীকুমার হাট-বাজারে যাতে বিলেতি দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় না হয় সেজন্য হাটের মালিক জমিদারগণকে পত্র লিখলেন। তিনি ভাবে ও কর্মে প্রকৃতই অন্য নেতাদের চাইতে স্বতন্ত্র ছিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন প্রকৃতই একজন গণনায়ক, যিনি স্বদেশি আন্দোলনের শুরুতেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রামের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায়ই বরিশালে স্বদেশি আন্দোলন গণভিত্তিক একটি সুদৃঢ় সংগ্রামে পরিণত হয় এবং বরিশাল জেলা কার্যত স্বদেশি আন্দোলনের দুর্ভেদ্য দূর্গে পরিণত হয়। কিন্তু কলকাতাকেন্দ্রিক নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্য আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের কথা মাথায় রেখেই তখন থেকে আন্দোলন পরিচালনা করে ভবিষ্যতের জন্য দেশভাগের পথ তৈরি করে রেখেছিলেন। তাঁদের ভুল পদক্ষেপের জন্যই ব্রিটিশ সরকার তার ভেদনীতি প্রয়োগ করে দেশের অন্যত্র দাঙ্গা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কিন্তু অশ্বিনীকুমারের নিজস্ব কর্মস্থলে তারা এ ব্যাপারে সুবিধা করতে পারেনি। এর একটাই কারণ, তাঁর আন্দোলনের গণভিত্তি। এ বিষয়ে *ইংলিশম্যান* পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য ' Barisal is probably the only where there is a systematic organization and where the volunteers have done no immense mischief. The organization is nowhere so complete as at Barisal.'[৩]

অশ্বিনীকুমার দত্ত ও স্থানীয় মুসলিম নেতাদের অংশগ্রহণের কারণে স্বদেশি আন্দোলনের সময় বরিশালে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক অটুট ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: ১৯০৬ সালের ১৮ এপ্রিল বরিশাল কনফারেন্সের সময় লাঞ্ছিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনে কলেজ স্কোয়ারে যে বিপুল জনসমাবেশ হয় সেখানে লিয়াকত হোসেন ও মুজিবর রহমান মুসলমানদের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তৃতা দেন। ১৯০৬ সালের ২০ মে বরিশালে হিন্দু-মুসলমান জনতার যে বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়, তাতে জনগণের 'বন্দেমাতরম' ও 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে সমস্ত শহর মুখর হয়ে উঠেছিল। এ শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং ব্যারিস্টার মোতাহার হোসেন, চরমুদ্দের জমিদার চৌধুরী ইসমাইল খাঁ ও মহম্মদ আস্রাফ।[৪] স্বদেশবান্ধব সমিতির উদ্দেশ্য ছিল

বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ ও স্বদেশি আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের বিলেতি দ্রব্য বর্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বরিশালবাসী স্বদেশি পণ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। স্বদেশি পণ্য সহজে ক্রয় করার নিমিত্তে ব্রজমোহন কলেজের তৎকালীন উপাধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন ঘোষ চকবাজারে একটি দোকান খুলেছিলেন। স্বদেশবান্ধব সমিতির মাধ্যমে বরিশাল জেলায় মৃতপ্রায় কুটির শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে জাগরণী গান গেয়ে চারণ কবি মুকুন্দ দাস বরিশালের জনগণকে স্বদেশি পণ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সে সময় সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের কণ্ঠ-ধ্বনিত প্রেরণাদায়ক সংগীতগুলো ছিল নিম্নরূপ :

ওরে তাঁতী ভাই, একটি কথা তোরা
মন লাগিয়ে শুনিস।
তোদের ঐ পুরানো তাঁতে
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে,
আমি মাথায় করে নিয়ে যাব রে–
তুই ঘরে বসে টাকা গুনিস।

এছাড়াও শোনা যেত

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন-দুখিনী মা যে মোদের–
তার বেশি আর সাধ্য নাই।[৫]

বরিশালের সর্বত্র মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের আহ্বানে এক বিস্ময়কর গণজাগরণ দেখা দেয়। বরিশালের তখনকার পরিস্থিতিকে হীরালাল দাশগুপ্ত নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

> যখন অশ্বিনী কুমার দেশমাতৃকার পুণ্য নামে সেবকের জন্য আহ্বান জানালেন, বালক যুবক প্রবীণ সকলেই সাড়া দিলেন। সে এক বিস্ময়কর জাগরণ। বিলাতি কাপড় বস্তাবন্দি হল ব্যবসায়ীদের গুদামে। বিলাতি কাপড় ও নুন বিক্রয় বন্ধ হল শুধু বরিশালে নয়, জিলার দূরতম প্রান্তের বাজার, হাট ও বন্দর থেকেও জিনিসগুলো অদৃশ্য হল ভোজবাজির মতো। ম্যাজিস্ট্রেট নিজে দোকানে দোকানে ঘুরে একখন্ড বিলাতি কাপড় কিনতে পারলেন না। 'অশ্বিনী বাবুর হুকুম ছাড়া বেচতে পারব না' – এই হল ব্যবসায়ীদের জবাব। নূতন বাজার খোলা হল সরকারি অর্থ ব্যয়ে। সেখানে সরকারের অনুগৃহীত কিছু কিছু লোক বিক্রেতা হিসাবে পসরাও সাজাল। কিন্তু ক্রেতার অভাবে বাজার বন্ধ হয়ে গেল। নদীপথে মাঝিদের মুখে, শহরে গাড়োয়ানদের মুখে, পল্লিতে পল্লীতে জনগণের মুখে ধ্বনিত হতে লাগল একটি মন-মাতানো শক্তিসঞ্চারী মোহনমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'। বরিশালে বয়কটের সাফল্য পল্লিগ্রামে বহু দিনের স্তব্ধ তাঁতিদের ঘরে নূতন করে তাঁতের ঠকঠকানির শব্দ আতঙ্কিত করেছিল ইংরেজ সরকারকে। পূর্ববঙ্গ ও আসামের নূতন ছোটলাট ব্যামফাইলড ফুলার শাসনদণ্ড আস্ফালন করলেন। বিলাতে পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় 'বরিশাল' একটা সমস্যা নামে অভিহিত হল। ভারত সাম্রাজ্যের ভিতরে দুইটি দুর্দমনীয় শক্তি পার্লিয়ামেন্টের শির:পীড়ার কারণ হয়ে রইল – একটি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অশান্ত পার্বত্য জাতি, অন্যটি বরিশাল।[৬]

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সহযোগী ছিলেন অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি.এম স্কুলের শিক্ষক আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়, কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, বিএম কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, উপাধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উকিল নিবারণচন্দ্র দাস, পূর্ণচন্দ্র দে, শরৎচন্দ্র গুহ, ডা. নিশিকান্ত বসু, সায়েস্তাবাদের নবাবজাদা ব্যারিস্টার সৈয়দ মোতাহার হোসেন, উলানিয়ার হাজী ওয়াহেদ রাজা চৌধুরী, শরৎকুমার রায়, ডা. তারিণীকুমার গুপ্ত, দুর্গামোহন সেন, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, চারণ কবি মুকুন্দ দাস, চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল

প্রমুখ।[৭] সে সময় খানবাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন আহমেদ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে থাকলেও বরিশালের মুসলমানদেরকে নিয়ে তিনি সরকারের পক্ষে শক্তিশালী জনমত গঠন করতে পারেননি। অন্যদিকে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও তাঁর স্বদেশবান্ধব সমিতির উদ্যোগে বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার গণআন্দোলনে রূপ নেয়। স্বদেশি আন্দোলনকে দমন করার জন্য প্রথম পর্যায়ে জেলার সর্বত্র পুলিশী অত্যাচার, জোর-জুলুম, ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি প্রদান করা হতো। এই সময় কিছু ব্যবসায়ী মফস্বল শহরে গোপনে বিলেতি বস্ত্রও বিক্রয় করত। কিন্তু মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে অবিচল থেকে জনসাধারণ স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নেয় এবং ব্রিটিশ সরকারের সকল অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এই সময় লবণের নৌকা ডুবিয়ে দেয়া, হাটে বিলেতি কাপড় ও লবণের দোকানে অগ্নিসংযোগ করার মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। বিশেষ করে বরিশাল জেলার উজিরপুর, মাহিলাড়া, বাটাজোর, গৈলা ও ভোলায় এই ধরনের অগ্নিসংযোগের ঘটনা বেশি ঘটেছিল।[৮]

তৎকালীন বিভিন্ন পুলিশ রিপোর্ট ও প্রশাসনিক নথিপত্র থেকে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়। ১৯০৭ সালের ১৭ জুন ১৫/সি নং স্মারকপত্রে বরিশালের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট R. Hughes Buller ঢাকার কমিশনারকে স্বদেশি আন্দোলনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ভূমিকা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে এক লিখিত পত্রে বলেন :

> ...Indeed if we exclude Calcutta leaders like Surendra Nath Banerjee and Bipin Chandra Pal, it would be difficult to find any other agitator in the two provinces of Bengal and Eastern Bengal and Assam whose name is so often quoted and to whose word so much weight is attached. In Local circles Ashwani Babu's influence is far greater than of the other two men. It is open secret that Babu Ashwani Kumar Datta, as recognized head of the Swadeshi Movement, not only in Barisal and throughout Bakarganj, but also throughout Bengal, is in close touch with the leaders in Calcutta, and that he belongs to the Extremist Party headed by Bipin Chandra Pal. Probably his influence in Eastern Bengal is greater than that of Bipin Chandra Pal, because he accustomed to deal with the people of the Country. In short, Babu Ashwani Kumar Datta has become a perfect firebrand, and his present tour indicates that he is prepared at hazards to continue his agitation against Govt. to the better end. He is one of our enemies and Govt. should beware of him.[৯]

১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রধান সেক্রেটারি মি. লায়ন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাতেও স্বদেশবান্ধব সমিতির প্রতি প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠে। রিপোর্টে বলা হয় :

> It will be seen that as has already been reported to the Government of India, the organization of the agitation in the interior of Bakarganj is far superior to that which has been observed in any other district of the province. The Bandhab samiti, which professes admirable objects, is undoubtedly allied to the revolutionary societies and is an agent for the dissemination of sedition, has over 150 branches in different parts of the province and does a great deal of work in spreading disaffection among the masses, ' Mr. Lyon went on to point out 'a desire for independence of the British Government in all branches, a feeling which naturally engenders anti-British propaganda at the ordinary meeting of the Samiti and its branches.' Mr. Lyon further went on to say - 'As remarked by the magistrate, the provisions of the Risley Circular was entirely set at naught during the proceedings of the meeting (of the Samiti). ... There can be little doubt that the Bandhab samiti under the guidance of Babu Ashwini Kumar

> Dutta is doing grievous harm in spreading racial hatred among the lower classes and false information as to the Government's proceedings and instructions.[10]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য ভারত সরকার ১৯০৮ সালের ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর বাংলার নয় জন নেতাকে গ্রেফতার করে নির্বাসনে পাঠায়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিএম কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বানারীপাড়ার মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা। পরবর্তীতে ১৯১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তকে মুক্তি দেয়।[১১] এদিকে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে স্বদেশি আন্দোলন ও তৎপরবর্তী সময়ে যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয় তা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। বাংলায় স্বদেশি আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে বরিশাল জেলায়। এই সাফল্যের অন্যতম প্রধান দিকগুলো ছিল, প্রথমত মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের মতো একজন স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ব্যক্তিত্বের হাতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল; দ্বিতীয়ত বরিশাল জেলায় স্বদেশি আন্দোলন সবচেয়ে বেশি গণভিত্তি লাভ করে; তৃতীয়ত স্বদেশি আন্দোলনের সময় এই জেলায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ছিল অটুট এবং একই সাথে বন্দে মাতরম্ ও আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে বরিশালের রাজপথ মুখরিত হতো; চতুর্থত জেলার সমস্ত গ্রামে-গঞ্জে স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে এবং কঠোরভাবে বিলেতি দ্রব্য বর্জন কার্যকর হয়।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন

বরিশালে স্বদেশি আন্দোলনের সাফল্য সমগ্র ভারতকে আকৃষ্ট করে। তাই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯০৬ সালের ১৪ ও ১৫ এপ্রিল বরিশালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। উক্ত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৩ এপ্রিল খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমারযোগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আবদুল হালিম গজনবী, মতিলাল ঘোষ, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, আনন্দচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতা বরিশালে এসে পৌঁছেন।[১২] ঘোষণা মোতাবেক পুলিশী বাধা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে বরিশালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ব্যামফিল্ড ফুলারের আদেশে প্রকাশ্যস্থলে বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ হয়। বরিশালের কনফারেন্স উপলক্ষে কখন কোথায় বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারিত হতে পারবে সে সম্বন্ধে আয়োজকরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে ম্যাজিস্ট্রেট মি. এমারসন সম্মেলন অধিবেশনের অনুমতি দেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সভা শুরুর বর্ণনা দেন এভাবে :

> বেলা ২টার সময় শোভাযাত্রা শুরু হবে। নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধঘন্টা পূর্বে আমি যথাস্থানে উপস্থিত হলাম। শোভাযাত্রা সাজিয়ে আমরা শুরু করলাম। কনফারেন্সের নির্বাচিত সভাপতি মিঃ এ রসুল এবং তার সহধর্মিণী একখানা গাড়ীতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে চললেন। মিঃ রসুলের স্ত্রী ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে ছিলাম আমরা কয়েকজন- বাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং আমি। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্করা ছিলেন পিছনের দিকে। জোরদার পুলিশের দল সর্বদাই আমাদের চোখের সামনেই রইল। তাদের হাতে ছিল রেগুলেসন লাঠি। একজন সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এগিয়ে চললেন একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, পুলিশের এইরূপ ক্ষমতা প্রদর্শনের মত কোন ব্যাপারই সেখানে ছিল না। পরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া এই ক্ষমতা প্রদর্শনের কোন প্রয়োজনই ছিল না এবং এর কোন ব্যাখ্যাও চলে না।[১৩]

সম্মেলনের প্রথম দিনে পুলিশ কর্তৃক সাধারণ জনগণের লাঞ্ছনার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করা হয় এবং এখন থেকে আবেদন নিবেদনের প্রস্তাব পরিহার করে দেশবাসীকে ত্যাগ ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন,

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ ও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৪] সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা ব্যারিস্টার আবদুর রসুল।[১৫] সভাপতির ভাষণে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল বলেন :

> কোনো কোনো মুসলমান নেতা দলস্থ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করেন যে, ইহা একটি হিন্দু আন্দোলন ও সেই কারণে 'ডিসলয়াল'। আমি বলি, নেতাদের বাক্য অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে না নিয়ে যদি তারা নিজেদের মনে একটু চিন্তা করে দেখে তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, হিন্দুগণ অপেক্ষা এই আন্দোলনে মুসলমানদের উপকার বেশি হচ্ছে। কোনো মুসলমান কি অস্বীকার করতে পারবে যে, স্বদেশী আন্দোলনে দেশের বয়ন শিল্পের যে উন্নতি হয়েছে, তাতে মুসলমান তাঁতিরা উপকৃত হচ্ছে না। এই কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে যে কলিকাতার বহু দরিদ্র মুসলমান পরিবার, যারা এতদিন অনাহারে মারা পড়েছিল, তারা এক্ষণে বিড়ি শিল্পের উন্নয়নে ভালভাবে জীবিকা উপায় করছে না।[১৬]

এছাড়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও সম্পাদক ছিলেন রজনীকান্ত দাস এবং তিনশত ছাত্রের সমন্বয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র। ১৪ এপ্রিল সম্মেলনের সভাপতি ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের নেতৃত্বে শহরে শোভাযাত্রা বের হয়। সরকারি নিষেধ অমান্য করে শোভাযাত্রা থেকে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হলে গুর্খা পুলিশ শোভাযাত্রার উপর লাঠি চালায় এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে গ্রেফতার করে।[১৭] সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ১৮৮ ধারায় অভিযোগ গঠিত হয়। বিচারে প্রথমে দুইশত টাকা এবং বিচারের সময় আদালত অবমাননার অভিযোগে আরও দুইশত টাকাসহ মোট চারশত টাকা জরিমানা করা হয়।[১৮] বরিশালে অনুষ্ঠিত এ প্রাদেশিক সম্মেলন সর্ম্পকে ড. আর সি মজুমদার বলেন :

> বরিশাল কনফারেন্সে ফুলারের অত্যাচার এবং স্বদেশী আন্দোলন কেবল যে বাঙ্গালীকে সুপ্ত জাতীয়তাবোধ জাগরণে সাহায্য করিয়াছিল তাহা নহে, সমগ্র ভারতে এই আন্দোলন একটি জাতীয় ঐক্যের সূত্র বন্ধনে সহায়ক হইল। বাংলায় যে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি স্থাপনের চেষ্টা এতদিন সাফল্য হয় নাই, এই বার তাহা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।[১৯]

বঙ্গীয় কংগ্রেসের এ প্রাদেশিক সম্মেলনের সময়ই লাখুটিয়ার তরুণ জমিদার ও কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী বরিশালে প্রথম বারের মতো বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করেন। সম্মেলন উপলক্ষে ১৫ এপ্রিল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীসহ অনেক সাহিত্যরথী বরিশালে আসেন।[২০] সম্মেলনের সভাপতি করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কিন্তু পুলিশী বাধায় বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনটি বাধাগ্রস্ত হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। এসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আগত অতিথিরা বরিশাল ভাটার খালে নৌকায় অবস্থান করছিলেন। আগত অতিথিরা বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনের শোভাযাত্রায় পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৬ এপ্রিল বরিশাল ত্যাগ করেন।[২১]

বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ভারতে গুপ্তসমিতির আয়োজন প্রথম শুরু হয়েছিল বসুদেব বলবন্ড ফাড়কের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে। তিনি ১৮৮৯ সালের ৩ জুলাই ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন এবং বিচারে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড দিয়ে তাকে এডেনে নির্বাসিত করা হয়। এরপর পুনাতে ১৮৯৭ সালে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক র‍্যান্ড ও আয়াস্ট নামে দুজন ইংরেজকে হত্যার মাধ্যেমে এই কাজ তরান্বিত হয়।[২২] এভাবেই ইউরোপ ও ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে একটি নতুন আদর্শ স্বাধীনতাকামী ছাত্র ও যুবকদের সামনে উপস্থাপিত হয়। তারা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* এবং বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলিতে স্বাদেশিকতার সুরকে অনুসরণ করে একটি নতুন আদর্শ সৃষ্টি

করেন। এই আদর্শ ও ভাবধারার ভিত্তিতে প্রথম যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তার নাম অনুশীলন সমিতি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'অনুশীলন' নাম থেকেই সমিতির নামকরণ করা হয়।[২৩]

স্বদেশি আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক থাকলেও তা কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে ব্যর্থ হলে প্রতিবাদ আন্দোলনটি বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনের নেতাদের স্বদেশি গ্রহণ আর বিদেশি বর্জনের আদর্শই বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুবকদের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। তারা ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করার তাগিদ অনুভব করে এবং এই তাগিদেই তারা নিয়মতন্ত্রের পথ পরিহার করে হিংসা ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে। এ সময় বাংলার বিভিন্ন জেলায় কিছু সমিতি স্থাপিত হয়। তার মধ্যে কলকাতার যুগান্তর, বরিশালের স্বদেশবান্ধব, ফরিদপুরের ব্রতী, ঢাকার অনুশীলন, ময়মনসিংহের সুহৃদ, বিপিন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে পরিচালিত আত্মোন্নতি সমিতি, অরবিন্দ ও বারীন ঘোষের নেতৃত্বে পরিচালিত মুরারিপুকুর বাগানের দল, অনিল রায়ের শ্রীসংঘ, মাদারীপুরের পূর্ণদাসের শান্তিসেনা সমিতি, পাবনা সম্মিলনী, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও নরেনঘোষ চৌধুরীর বরিশাল দল ও তার ত্রিপুরা এবং নোয়াখালী শাখা, ময়ময়সিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর নেতৃত্বে সাধনা সমিতি, ময়মনসিংহের সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের দল, জ্ঞান মজুমদার ও তার দল, ঢাকার মদনমোহন ভৌমিকের দল, লীলা নাগের দল, ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের মুক্তিসংঘ, চট্টগ্রামের সূর্যসেনের দল, বগুড়ার যতীন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গের জেলা সমূহের বিপ্লবী দল, যশোর-খুলনা সমিতি, যশোরের বিজয় রায়ের দল, টাঙ্গাইলের সুহৃদ সমিতি, বরিশালের সতীন্দ্রনাথ সেনের তরুণ সংঘ ও কুমিল্লার বিপ্লবী নেতা ললিত মোহন বর্মণের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিপ্লবী দল। সর্বশেষ বাংলার সমস্ত গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সমন্বয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল ভলান্টির্য়াস।[২৪] এছাড়াও বাংলার আনাচে কানাচে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন। ১৯০৭ সালের পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে পূর্ব বঙ্গে এধরনের সমিতির প্রকাশ্য সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৪৮৫ জন। সরকারি এক হিসেবে জানা যায় ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত অভিযুক্ত ১৮৬ জন বিপ্লবীর মধ্যে ৬৮ জন ছিল ছাত্র, ১৬ জন শিক্ষক, ১৯ জন ভূস্বামী, ২৩ জন অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং ১ জন কৃষক।[২৫] সম্প্রদায়গতভাবে বিপ্লবীদের প্রায় সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। এসব সংগঠনের মধ্যে অনুশীলন ও যুগান্তর সন্ত্রাসবাদের পথ অবলম্বন করে।[২৬]

বরিশাল জেলায় দুটি বিপ্লবী সংগঠন দানা বেঁধেছিল এবং উভয় সংগঠনই জেলার প্রতিটি শহরে এবং গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটি হচ্ছে ঢাকা অনুশীলন সমিতির বরিশাল শাখা এবং অপরটি বরিশালের সম্পূর্ণ নিজস্ব সংগঠন যা বরিশাল দল নামে পরিচিত। অনুশীলন সমিতি প্রথমে কলকাতায় গঠিত হলেও পরে ঢাকা শাখা হয়ে উঠেছিল এর যাবতীয় গুপ্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। প্রমথ মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস ১৯০৩ সালে কলকাতায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৯০৫ সালে ঢাকায় এর শাখা স্থাপিত হয় এবং পুলিনবিহারী দাস ঢাকা অনুশীলন সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৭ সালের মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রের অধীনে প্রায় ৫৭টি শাখা কেন্দ্র খোলা হয়। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির ব্যাপক কর্মতৎপরতা ছিল। এ দলের প্রধান দুটি কেন্দ্র ছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামে। এর বাইরে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশালে এর শক্ত ঘাঁটি ছিল।[২৭] বরিশাল অনুশীলন দলের প্রধান সংগঠক ছিলেন দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ, গোপাল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ রায়। এ দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন : দেবকুমার ঘোষ, তারা গুপ্ত, কুমুদ গুহ ঠাকুরতা, শাহজাহান চৌধুরী, শাহ আলম চৌধুরী, নুরুল ইসলাম খান সুলতান, মুজিবর রহমান চৌধুরী, নরেন সেন প্রমুখ।[২৮] এছাড়া বরিশালের বহু যুবক ও ছাত্র অনুশীলন দলে যোগ দেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান রাখেন। ১৯০৮ সালে কলকাতায় আইনজীবী কেনেডীর পত্নী ও কন্যা হত্যা মামলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় এবং তার সাথে বরিশাল অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী সুরেশ গুপ্ত ও ওয়াজেদ আলীর

দুমাস কারাদণ্ড হয়। ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর বিপ্লবীরা বরিশালের পুলিশ ইন্সপেক্টর মনমোহন ঘোষকে সদর গার্লস স্কুলের নিকট গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবীদের দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১২ সালে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এ মামলায় বরিশাল ও বরিশালের বাহিরের মোট ৪৪ জন অনুশীলন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তাদের মধ্যে ৩৭ জন ধরা পড়ে এবং ৭ জন পলাতক থাকে। বরিশালের যারা এ মামলায় জড়িত ছিলেন তারা হলেন : দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, গোপাল মুখার্জী, যতীন্দ্রনাথ রায়, চণ্ডীচরণ বসু, নরেন সেন, নলিনী দাশ, গোপাল মিত্র, নিবারণ কর, মুকুন্দ গুহ, নিশিকান্ত গুপ্ত, যতীন্দ্র রায় ও প্যারী দাস।[২৯] এ মামলায় সরকার পক্ষের উকিল ছিলেন ব্যারিস্টার নলিনী গুপ্ত, ঢাকার রায় বাহাদুর শশাংক ঘোষ এবং বরিশালের সরকারি উকিল রাজেন্দ্র বাড়ুরী। অন্যদিকে আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন বিসি চ্যাটার্জী, বরিশালের শরৎচন্দ্র গুহ, বরদাকান্ত বসু। চার বছর চলার পর ১৯১৫ সালে মামলাটি শেষ হয়। মামলার রায়ে মোট ১২ জনকে এক মাস হতে ছয় মাস পর্যন্ত জেল দেয়া হয়। এছাড়া ১৯১৯ সালে কলকাতার মাছুয়া বাজারে বোমা হামলার মামলায় বরিশালের নলছিটির সচিত্রকর ও গৌরনদীর মহেন্দ্রের ৭ বছর জেল হয়। ১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্য সেনের সাথে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় বরিশালের কাশীপুর নিবাসী বিপ্লবী ক্ষিরোদরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় অংশ নিয়েছিলেন।[৩০]

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত যুগান্তর দল ছিল প্রধানত কলকাতাকেন্দ্রিক। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ ও তার ভাই বারীন্দ্র ঘোষ। বরিশালে যুগান্তর দল বরিশাল পার্টি বা বরিশাল দল নামে পরিচিত ছিল। ১৯০৬ সালে বরিশাল কনফারেন্সের পর বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে বারীন্দ্র ঘোষ বরিশালে আসেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে তাকেই তিনি বিপ্লবী দল গড়ে তোলার উপযুক্ত মনে করলেন। এ সময় তিনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ৪৫০ বোরের একটি রিভলভারও দিলেন। অবশেষে ১৯০৮ সালে বিএম স্কুলের শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরীর সহযোগিতায় গড়ে উঠলো বরিশাল পার্টি ।[৩১] ১৯১২ সালে এই সংগঠন এক করার জন্য উভয় পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিন্তু এই সময় নেতৃবৃন্দ বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার কারণে এই একত্রীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৩ সালে বরিশাল দল বিভক্ত হয়ে একটি অংশ স্থানীয়ভাবে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের নেতৃত্বে থাকে। অন্য অংশ কলকাতায় গিয়ে সেখানকার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর আত্মোন্নতি সমিতির সাথে সংযোগ স্থাপন করে। বরিশাল দলের অন্যান্য বিপ্লবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন : মনোরঞ্জন গুপ্ত, হীরালাল দাশগুপ্ত, অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী, অরুণচন্দ্র গুহ, সতীন্দ্রনাথ সেন, সরলকুমার দত্ত, পঞ্চানন বসু, সুধীরকুমার আশ্চার্য, মনোজকুমার কাহালী, সুধীরকুমার রায় চৌধুরী, ইন্দুভূষণ দাসগুপ্ত প্রমুখ।[৩২] বরিশাল যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা অস্ত্র সংগ্রহের জন্য জেলার ভিতরে ও বাইরে বেশ কয়েকটি ডাকাতি করে। এসব ডাকাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : নায়ার সাহেবের বাড়ী থেকে বন্দুক চুরি (১৯০৮), আলেকান্দায় ডাকাতি (১৯০৮), দেহেরগতি ডাকাতি (১৯০৮), মোহনগঞ্জ ডাকাতি (১৯১০), লক্ষণকাঠি ডাকাতি (১৯১১), প্রতাপপুর ডাকাতি (১৯১২), গাজিপুর ডাকাতি (১৯১৫), ধানুকাঠি ডাকাতি (১৯১৬)।[৩৩] এছাড়া ১৯১৫ সালে নদীয়া জেলার শিবপুরে ডাকাতির সময় নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, হীরালাল দাশগুপ্ত, সতীন সেন প্রমুখ ধরা পড়েন। বিচারে নরেন্দ্র মোহন দ্বীপান্তর এবং বাকীদের বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেয়া হয়।[৩৪] ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত সাধনা সমিতির সঙ্গে বরিশাল দলের সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৯১৫ সালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গড়ে ওঠা যতীন রায়ের দলের সঙ্গেও বরিশাল দলের অনুরূপ সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৯১৫ সালের মাঝামাঝিতে কলকাতার যতীন মুখার্জীর দলের সংগে বরিশাল দলের এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, দুদলই একযোগে জার্মান সরকারের প্রদত্ত অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লব ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করবে। তবে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন অভারতীয় ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় জার্মান সরকারের সাহায্যের চেষ্টাটি ব্যর্থ

হয়।[৩৫] ১৯৩০ সালে কলকাতায় পুলিশ কমিশনার মি. টেগার্ট এর উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় বরিশালের দলের সদস্য অরুণচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত অংশ নেন। এছাড়া ১৯৩০ সালে তাদের বরিশাল অস্ত্রাগার লুণ্ঠনেরও পরিকল্পনা ছিল কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। ১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে বাংলাসহ ভারতের বিপ্লবী দলগুলো তাদের সংগঠনগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক দলসমূহে যোগদান করে।[৩৬]

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন কর্তৃক তুরস্কের খেলাফত আক্রান্ত হলে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা ব্রিটিশ সরকারের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে বোম্বের মুসলিম ব্যবসায়ীগণ মজলিশে খেলাফত নামে একটি সংস্থা গঠন করে এবং লক্ষ্ণৌতে একটি সর্বভারতীয় মুসলিম কনফারেন্স আহ্বান করে। অতঃপর লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে একটি সর্বভারতীয় খেলাফত কমিটি গঠন করা হয়।[৩৭] মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী ও মওলানা আবদুল বারী প্রমুখ ভারতের খেলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। মহাত্মা গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন।[৩৮] বরিশালের মুসলমান সম্প্রদায় মওলানা মুহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর আহ্বানে খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বরিশালে খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন আহমেদকে সভাপতি, মৌলভী আসগর আলীকে সহ-সভাপতি এবং খান বাহাদুর হাশেম আলী খানকে সম্পাদক করে বরিশাল জেলা খেলাফত কমিটি গঠন করা হয়।[৩৯] খেলাফত আন্দোলনে এ জেলায় আরও যারা নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : ওয়াহেদ রাজা চৌধুরী, সুলতান আহম্মদ চৌধুরী, মাজেদ আলী, সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, ওবায়দুল গণি চৌধুরী, উকিল মফিজ উদ্দীন, উকিল সৈয়দ আলী হোসেন, খান সাহেব হাতেম আলী জমাদ্দার, গুলিশাখালীর আজাহার উদ্দীন আহম্মদ, বরগুনার আবদুল কাদের লাল মিয়া, বেতাগীর আবি আবদুল্লাহ, পটুয়াখালীর উকিল ফজলে করিম ফজুমিয়া, উকিল মোহাম্মদ আকরম এমদাদ মোক্তার, নূর আহম্মদ সিকদার, মাওলানা নাসিরউদ্দীন, কলসকাঠির হাশেম তালুকদার, পিরোজপুরের সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল মোক্তার প্রমুখ।[৪০] ছাত্র ও যুবক কর্মীদের মধ্যে ছিলেন: আজিজ উদ্দিন আহমেদ, আবদুল ওহাব খান, সৈয়দ কুতুব উদ্দিন, মুহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, মোফাজ্জেল হক, আবদুর রাজ্জাক সিকদার, সৈয়দ হাবিবুর রহমান প্রমুখ।[৪১] খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে বরিশালের অনেক নেতাকর্মী কারা ভোগ করেন আবার অনেকে নানাভাবে নির্যাতিত হন। খেলাফত আন্দোলন বরিশালের মুসলিম সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। কিন্তু ভারতবর্ষে খেলাফত আন্দোলন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কারণ ১৯২৪ সালে তুরস্কের কামাল পাশা কর্তৃক সেখানকার খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের খেলাফত আন্দোলন তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।[৪২]

খেলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি ব্রিটিশ ভারতে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন নামে আরও একটি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯২০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ১৮৫৫-৮৭৩ ভোটে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৪৩] মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাতেও এই আন্দোলন গতি পায়। বরিশালে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এ জেলায় অসহযোগ আন্দোলনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তার সভাপতি ছিলেন উজিরপুরের প্যারীলাল রায় এবং সম্পাদক ছিলেন গুরুচরণ আইচ। তবে অসহযোগ আন্দোলনে জেলার সর্বাধিনায়ক ছিলেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। অশ্বিনীকুমার দত্ত অসুস্থ থাকায় শরৎকুমার ঘোষ, শরৎ গুহ, হাশেম আলী খান, ওয়াহেদ রাজা চৌধুরী, নগেন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীন সেন, ডা. তারিণী গুপ্ত, মনোরঞ্জন গুপ্ত, চারণ কবি মুকুন্দ দাস প্রমুখ বরিশালে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।[৪৪] এ

আন্দোলনের শুরুতেই সিদ্ধান্ত হয় যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজা বাহাদুরের হাবেলিতে (বর্তমান অশ্বিনী কুমার টাউন হল) প্রকাশ্য সভার মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করা হবে। একের পর এক এবং কার পর কে আইন অমান্য করে জেলে যাবে, তারও একটা তালিকা তৈরি করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রথমে মনোরঞ্জন গুপ্ত, তারপরে সরলকুমার দত্ত, নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যরা আইন অমান্য করে রাজা বাহাদুরের হাবেলিতে প্রবেশ করবে। এভাবে বরিশাল শহরে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং বহু লোক তাতে গ্রেফতারও হন।[৪৫]

বরিশাল শহরের এ আন্দোলন ক্রমান্বয়ে জেলার অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে ১৯২১ সালের মে মাসে পিরোজপুর ন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনন্তপ্রসাদ সেনগুপ্তসহ কয়েকজন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদে ১৩ মে পিরোজপুর শহরে হরতাল পালিত হয়।[৪৬] প্রধান শিক্ষক জামিন নিতে অস্বীকৃতি জানালে অন্যান্যদের মুক্তি দেয়া হয়। জামিনে মুক্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে বরিশাল থেকে কংগ্রেস নেতা দুর্গামোহন সেন, সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং বিভূতিমোহন বক্সীকে সঙ্গে নিয়ে অহিংস আন্দোলনের পুরোধা শরৎকুমার ঘোষ পিরোজপুর চলে আসেন। তিনি জামিনে মুক্তি নেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন।[৪৭] পিরোজপুরে সংগঠিত অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ১৯২১ সালের ১৯ মে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় :

> পিরোজপুর মহকুমায় অহিংস অসহযোগের আন্দোলন বেশ ভালোভাবেই প্রসার লাভ করছে। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে প্রায় শ-খানেক সভা করা হয়েছে। স্থানীয় ধামাধরার দল অসহযোগের বিরুদ্ধে এক সভা ডেকেছিল। কিন্তু যারা ডেকেছিল, তারা অবাক হয়ে দেখল যে তাদের সে সভা অসহযোগের পক্ষপাতী সভা হয়ে উঠল। পিরোজপুরে দুটো জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ছাত্রসংখ্যাও প্রচুর হয়েছে। স্থানীয় বহু উকিল-মোক্তার আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন।[৪৮]

অতঃপর পিরোজপুরের এ গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৮ মে বরিশালে এবং ১৯ মে ভোলায় হরতাল পালিত হয়।[৪৯] ঝালকাঠি ও পটুয়াখালীতে একই কারণে হরতাল পালিত হয়। হাশেম আলী খান তাঁর নিজ গ্রাম স্বরূপকাঠী থানার সেহাঁঙ্গলে জনসভা করে কৃষক সমাজকে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।[৫০] অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে হাশেম আলী খানের বিরুদ্ধে লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার অ্যাক্ট অনুসারে মামলা দায়ের করা হয় এবং একই সাথে তাঁর আইন পেশার সনদপত্র সাময়িকভাবে বাতিলও করা হয়।[৫১] অসহযোগ আন্দোলনে পিরোজপুরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ, চরকা প্রচলন এবং কংগ্রেসের তিলক স্বরাজ ভান্ডারের জন্য চাঁদা আদায়। এসময়ে পিরোজপুরে কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ হয়েছিল প্রায় ৭৫০০ জন, চরকা প্রচলন হয়েছিল প্রায় ১৫০০টি এবং তিলক স্বরাজ ফান্ডে জমা পড়েছিল ৩০০০ টাকা। পিরোজপুরের কর্মীদের চেষ্টায় পিরোজপুর, বানারীপাড়া ও বাইসারী গ্রামে তিনটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। পিরোজপুর মহকুমা কংগ্রেম কমিটির অধীনে ৪০টি শাখা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল। যার মধ্যে বানারীপাড়া, খলিসাকোটা, স্বরূপকাঠি, জলাবাড়ি, মুনিনাগ, সোহাগদল, সমুদয়কাঠি, কাউখালী, আমড়াঝুড়ি, জুলুহার, মৈষাণী, ভান্ডারিয়া, চেচড়ী, মঠবাড়িয়া, গাজীপুর, আমুয়া, পাথরঘাটা অন্যতম।[৫২] ১৯২১ সালে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনি ঘোষিত হলে পিরোজপুর কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বহু কর্মী গ্রেফতার হয়।

১৯২১ সালে ভোলায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় যৌথভাবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির আহ্বানে ধর্মঘটে ভোলায় পাঁচজন ছাত্র গ্রেফতার হন। যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র নলিনী দাস। তবে অল্প বয়সের কারণে একদিনের সাজা দিয়েই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। উকিল দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ ঘোষ, উকিল

কালিদাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, উকিল কেদারনাথ সেন, মোক্তার গুরুনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ আইনজীবী তিন মাসের জন্য তাদের আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।[৫৩] ভোলায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। চাঁদপুরের বিপিন চক্রবর্তী জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং চট্টগ্রামের মৌলভি মুসা জাতীয় মাদ্রাসার প্রধান নিযুক্ত হন। ভোলায় মহিলা কর্মীরাও অসহযোগ আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। চুনীলাল সেনগুপ্তের স্ত্রী সরজুবালা সেনগুপ্তের নেতৃত্বে মহিলারা অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন। ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার মানিকা এবং কুতুবার এলাকার জনগণও খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। বোরহানউদ্দিনের বর্তমান মাদ্রাসা ঘরটি আন্দোলনের সময় স্বরাজ অফিস নামে বিখ্যাত ছিল।[৫৪]

ঝালকাঠিতে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রজনী চট্টোপাধ্যায়, ললিত বন্দোপাধ্যায়, হেমন্তসেন চৌধুরী, বসন্ত ঘটক, উপেন্দ্র পাল, রসিকচন্দ্র পাল, রাজা সত্যমোহন ঘোষাল, কেরামত আলী প্রমুখ। ১৯২১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী বরিশাল থেকে ফেরার পথে ঝালকাঠির নদীর তীরে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। সে সময় সত্যমোহন ঘোষাল তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। একই বছর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং তাঁর পত্নী বাসন্তী দেবী ঝালকাঠি পরিদর্শন করেন।[৫৫] আন্দোলনের ব্যাপকতার জন্য ঝালকাঠি কংগ্রেস কমিটি মহকুমার মর্যাদা লাভ করে। ১৯২১-২২ সালে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী।[৫৬] ঝালকাঠি মহকুমার নথুল্লাবাদ, পনিহাটি, কীর্তিপাশা, গাভা, পোনাবালিয়া প্রভৃতি গ্রামের অনেকেই অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পটুয়াখালী শহরে সতীন সেনের নেতৃত্বে কেদারনাথ সমদ্দার, হীরালাল দাশগুপ্ত, গণেশ ভট্টাচার্য, নগেন্দ্র সেন গুপ্ত, সতীশচন্দ্র সেন, দীনেশ সেন, সুরেন্দ্র চ্যাটার্জী, ফণী চ্যাটার্জী, রবি রায়, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, আশু মুখার্জী, ফুকু মিয়া প্রমুখ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং অনেকে কারাবরণ করেন।[৫৭]

অসহযোগ আন্দোলনে বরিশালের গ্রামগুলোর মধ্যে গৈলা-ফুল্লশ্রীর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী। এই গ্রামের চিন্তাহরণ গুপ্ত, সুধীরচন্দ্র সেন, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলনে গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামের বহু কর্মী কারাবরণ করে। দরিদ্রবান্ধব সমিতি ও গৈলা-ফুল্লশ্রী যুবক সমিতি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অসহযোগ আন্দোলনে বাইশারী গ্রামও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে । গিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রনাথ সরকার, সতীন্দ্রনাথ দাশ, ডা. সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাদাত আলী প্রমূখ অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[৫৮] এছাড়া রহমতপুর, খানপুর, মাহিলাড়া, নরচিড়া, নারায়ণপুর, চন্দ্রহার, লতা, উত্তর শাহবাজপুর, মীর্জাকালু, অধুনা প্রভৃতি গ্রাম অসহযোগ আন্দোলনে এগিয়ে আসে। নলচিড়া ও মাহিলাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিদ্যালয়। মাহিলাড়া হীরালাল দাশগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র রায়, রামচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, অমৃতলাল দাশগুপ্ত, অধুনা গ্রামের মনোরঞ্জন গুপ্ত, চন্দ্রহারের দুর্গামোহন সেন, নলচিড়ার নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ রায়, ডা. কৃষ্ণকান্ত কর গুপ্ত, লতার জিতেন্দ্রমোহন গুপ্ত, নারায়ণপুরের লালমোহন উকিল, কেদারনাথ সেনগুপ্ত, খানপুরার পঞ্চানন বসু, রহমতপুরের সতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উজিরপুরের প্যারীলাল রায় অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে নির্যাতিত হয়েছেন।[৫৯]

বরিশাল জেলায় সংগঠিত খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার নানাভাবে দমনের চেষ্টা করে। সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন সময়ে গুর্খা পুলিশ বরিশাল জেলায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় পাঁচশত নেতা-কর্মীকে বন্দী করে। বরিশাল জেলের জেল সুপার ডা. মেজর মনরো

বন্দীদের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালান। এর প্রতিবাদে সতীন্দ্রনাথ সেন বরিশাল জেলে প্রায় ৬১ দিন অনশন করেন। হাশেম আলী খানসহ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাঁকে বাঁচানোর জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ডা. মেজর মনরোকে বরিশাল জেল সুপারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়।[৬০] অতঃপর সতীন্দ্রনাথ সেন অনশন প্রত্যাহার করেন।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে বরিশালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নাগপুর কংগ্রেসের পর ১৯২১ সালের মার্চ মাসে বরিশালে বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে বিএম স্কুলের মাঠে বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং সম্পাদক হন শরৎকুমার গুহ ও যুগ্ম সম্পাদক হলেন হাশেম আলী খান। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির বক্তৃতায় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তাঁর নির্দেশেই বরিশালে অসহযোগ আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়। সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই ১৯২১ সালে কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র অনুসারে বরিশালে জেলায় প্রথমবারের মত কংগ্রেসের জেলা কমিটি গঠিত হয়। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত সভাপতি, ডা. তারিণীকুমার গুপ্ত ও ওয়াহেদ রাজা চৌধুরী সহ-সভাপতি, দেবকুমার রায় চৌধুরী সম্পাদক, হীরালাল দাশগুপ্ত ও সরলকুমার দত্ত সহকারী সম্পাদক এবং হাশেম আলী খান, প্যারীলাল রায় ও দীনবন্ধু সাহা বিভাগীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৬১] ১৯২১ সালের ২ সেপ্টেম্বর দুদিনের সফরে মহাত্মা গান্ধী বরিশালে আসেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন মৌলানা মোহাম্মদ আলী। উভয় নেতা স্টিমার যোগে বরিশাল পৌঁছালে ১৭০০ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হিসেবে হাশেম আলী খান তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান।[৬২] পরদিন মহাত্মা গান্ধী অসুস্থ অশ্বিনী কুমারের গৃহে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মাঠে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধী বলেন :

> আমি দাঁড়াইয়া বলিতে অশক্ত, অতএব আমি বসিয়া বলিতেছি। অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদান্তে অশ্বিনীবাবুর অসুস্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তারপর শরৎকুমার ঘোষের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। 'তাহার আবার জেল হইয়াছে, সে জন্য আমার দুঃখ নহে– সরকার তাঁহাকে হোটেলে ডাকিয়া নিয়াছেন। এই সভায় তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়াই আমার দুঃখ। আপনাদের ঈপ্সিত স্বরাজ লাভ, খিলাফৎ উদ্ধার ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিকার করিতে হইলে তিনটি শর্ত পালন করিতে হইবে। প্রথম: হিন্দু–মুসলমানের একতা। বাহ্যিক একতা নহে। হিংসা-বিদ্বেষশূন্য হইয়া, পবিত্র খোদাতায়াল্লার নামে মনে মনে প্রাণে প্রাণে মিলনই প্রকৃত মিলন। এরূপ মিলন না হইলে আপনারা ঔপনিবেশিক স্বরাজের অধিকারী হইবেন, প্রকৃত স্বরাজ পাইবেন না। দ্বিতীয়: শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলন। খিলাফৎ ও কংগ্রেস সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ভগবান না করুন, আলী ভ্রাতৃদ্বয় জেলে গেলেও কোনপ্রকারে শান্তিভঙ্গ করিবেন না। কোনও রকম শান্তি ভঙ্গ হইলে আমাদেরই ক্ষতি, গভর্ণমেন্ট অত্যাচারের সুযোগ পাইবে। তৃতীয়: স্বদেশি গ্রহণ। বিদেশী সূতায় তৈয়রী কাপড়ও স্বদেশী নয়। আপনার দেশী তুলা হইতে ভাই ভগ্নী মাতা পিতা কর্তৃক সূতা প্রস্তুত করিয়া নিজ তাঁতে তৈয়ারী কাপড়ই পবিত্র এবং তাহাই স্বদেশি কাপড়। ইহা যে পর্যন্ত না হইবে, সে পর্যন্ত স্বরাজ লাভ হইবে না।[৬৩]

বিএম স্কুল মাঠে মহাত্মা গান্ধীর হিন্দী ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর উর্দু বক্তৃতা হাশেম আলী খান বাংলায় অনুবাদ করে উপস্থিত জনতাকে শোনান যা ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২২শে ভাদ্র বরিশাল হিতৈষী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৬৪]

উল্লেখ্য যে, মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ সালের এপ্রিলে বরিশালে আসার কথা ছিল। কিন্তু তখন তিনি আসতে পারেননি। সে সময় তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, 'আমি নিশ্চয় বরিশাল যাবো। তবে এই সময়ে সম্ভবপর হলো না। আমি কিন্তু বরিশালের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নই। কারণ যখন সমস্ত ভারত গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল, তখনও বরিশাল ছিল সদা-জাগ্রত।'[৬৫] এসব ঘটনা বরিশাল জেলার খেলাফত ও

অসহযোগ আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে। কিন্তু ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে উত্তেজিত জনতার হাতে ২২ জন পুলিশ নিহত হলে মহাত্মা গান্ধী ১২ ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। অবশ্য আন্দোলন বন্ধ হলেও ১৯২২ সালের মার্চ মাসে গান্ধীজীকে গ্রেফতার করা হয় এবং আদালতের বিচারে তাঁর ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৬৬] এরই ধারাবাহিকতায় বরিশালেও অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। এরই মধ্যে ১৯২২ সালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯২৩ সালের ৭ নভেম্বর কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বরিশালের রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক ধারা বিনষ্ট হতে থাকে।

স্টিমার ধর্মঘট

আসামের চা বাগানের কুলিদের প্রতি পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে বরিশালে স্টিমার ধর্মঘট পালিত হয়। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি স্টিমার কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[৬৭] বিহার প্রদেশের বহু কুলি করিমগঞ্জের চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। ১৯২১ সালের ১৪ ও ১৫ই মে তারা বিহারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে চাঁদপুর স্টিমার ঘাটে এসে সমবেত হয়। চা-শ্রমিকরা বিনা ভাড়ায় স্টিমারে যেতে চাইলে স্টিমার কোম্পানি তাতে আপত্তি জানায়। ক্রমশ পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠে। এরূপ পরিস্থিতিতে ২০মে গুর্খা পুলিশ উত্তেজিত চা-শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। এতে বহু সংখ্যক শ্রমিক খুন ও জখম হয়। এর প্রতিবাদে চাঁদপুর ও বরিশালে স্টিমার ধর্মঘট আরম্ভ হয়।[৬৮] ইংরেজদের পরিচালিত আর. এস. এন কোম্পানি এবং আই. জি. এন কোম্পানি তখন বরিশাল-খুলনা, বরিশাল-গৌহাটি, গোয়ালন্দ-চট্টগ্রাম, বরিশাল-মাদারীপুর, বরিশাল-পটুয়াখালী, বরিশাল-ভোলা প্রভৃতি লাইনগুলির একচেটিয়া স্টিমার ব্যবসায়ী ছিল। গৌহাটি থেকে কলকাতা পর্যন্ত চা আমদানি তখন ঐ স্টিমার পথেই চলত। পূর্ব বঙ্গে উক্ত কোম্পানিগুলোর প্রধান অফিস ছিল বরিশালে। কলকাতার পর বরিশাল ছিল স্টিমার কোম্পানির দ্বিতীয় প্রধান ডক। এই ডকেই স্টিমারগুলোর মেরামতের কাজ করা হতো। ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে স্টিমারের খালাসি ও কর্মচারীদের এক সভা অশ্বিনীকুমারের সভাপতিত্বে তাঁরই বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়।[৬৯] সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত দুই কোম্পানির স্টিমার-লাইনগুলিকে অচল করে দেওয়া হবে। এই ধর্মঘট পরিচালনার জন্য অশ্বিনীকুমারকে সভাপতি এবং হীরালাল দাশগুপ্তকে সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ধর্মঘট ঘোষণার পরদিন ডকে কোনো শ্রমিক যোগ দেয়নি এবং কেরানিরাও কেউ অফিসে করেনি। যেসব স্টিমার ডকে ছিল তাদের মেরামতের কাজও বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থা চলল দিনের পর দিন। স্বেচ্ছাসেবক দল শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করে চাল-ডাল সংগ্রহ করে আনতে লাগল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের দালান ও লম্বা টিনের ঘরগুলোতে সারেং, সুখানি ও খালাসিদের রাখা হলো।[৭০] স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল চব্বিশ ঘণ্টা ধর্মঘটীদের পাহারা দেওয়ার জন্য সেখানে রাখা হলো যাতে তারা স্কুলের সীমানার বাইরে যেতে না পারে। সে সময় তাদেরকে রেঁধে খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়।

লবণ আন্দোলন

বরিশালে লবণ আন্দোলন শুরু হয় ১৯২২ সালে। বিলেতি লবণ বিক্রির জন্য ইংরেজ সরকার এ দেশে লবণ উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। সরকারি আদেশ অমান্য করে ভোলা মহকুমার কৃষকরা দেশীয় লবণ উৎপাদন অব্যাহত রাখে এবং তারা উৎপাদিত লবণ মৃজাকালু, ভোলা, দৌলতখাঁ, তজুমদ্দিন, লালমোহন, বোরহানউদ্দিন ও মনপুরার বাজারে বিক্রি করতো। স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে বরিশালে বিলেতি লবণ পরিত্যাগ করে দেশীয় লবণের আন্দোলন শুরু হয়। দৌলতখাঁ থানার মৃজাকালু লবণ বিক্রির প্রধান কেন্দ্র ছিল।[৭১] ব্রিটিশ সরকার এই বন্দরে লবণ উৎপাদন ও বিক্রি

নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু কৃষকরা সরকারের নিষেধ উপেক্ষা করে লবণ উৎপাদন করতে থাকে, ফলে অনেক কৃষককেই পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে ভোলার উকিল দক্ষিণারঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঘোষ, আবদুল বারি, চুনীলাল সেন, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, নুর আাহমেদ সিকদার, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ লবণ আন্দোলন শুরু করেন। মৃজাকালু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হতে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত ছিল। আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সফলতার জন্য মৃজাকালুর আর এক নাম ছিল স্বরাজগঞ্জ। মৃজাকালুর অনুশীলন কর্মী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কংগ্রেস নেতা সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিলও বের হয়। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। মৃজাকালু বন্দরে দেশীয় লবণ বিক্রি হতে থাকে। সরকার এ খবর জানতে পেরে গুর্খা পুলিশ প্রেরণ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। গুর্খা পুলিশ প্রথমে লাঠি চার্জ করে আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়। ১৯২২ সালে সরকারের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। গুর্খা পুলিশ জনতার ওপর গুলি করলে মোট ৫০ জন আহত হন এবং পেয়ারপুর গ্রামের কোরবান আলী এবং বিশারাম গ্রামের কেরামত আলী মারা যান।[৭২] উক্ত ঘটনায় রাজকুমার দত্ত, বিনয় চক্রবর্তী, চন্দ্রমাধব গাঙ্গুলী, বেলায়েত হোসেন মাস্টার ও মুখলেসুর রহমান গ্রেফতার হন।

উপসংহার

১৯০৫ থেকে ১৯২৩ কালটি ছিল ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আত্মশক্তিতে নির্ভর ও আত্মশক্তি প্রয়োগের পর্ব। এ পর্বে একদিকে যেমন ছিল স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন অন্যদিকে ছিল বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির আন্দোলন। ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের উল্লিখিত আন্দোলনসমূহে বরিশাল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এ সময় বরিশাল জেলায় আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন অগ্নিযুগের অগ্নিপুরুষ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। বাংলায় বিশেষত পূর্ব বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি এমনকি সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বরিশাল ছিল একমাত্র অঞ্চল যেখানে স্বদেশি আন্দোলনের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি থাকা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ন্যূনতম অবনতি ঘটেনি। এটা সম্ভব হয়েছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বের কারণে। তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, যোগ্য নেতৃত্ব এবং উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বরিশালের স্বদেশি আন্দোলন ছিল আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনকে তৎকালীন প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস সমর্থন না করলেও পরবর্তীকালে ঠিকই তারা আন্দোলনের ফল-শস্য আহরণ করেছে। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ কংগ্রেসের আন্দোলনকে জোরদার ও শক্তিশালী করেছে। কংগ্রেসের আদর্শ ছিল স্বরাজ লাভ। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন 'সম্ভবপর হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজ লাভ, প্রয়োজন হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেই স্বরাজ লাভ'। কিন্তু বিপ্লবীরা মহাত্মা গান্ধীর এ স্বরাজকে কখনও মেনে নেয়নি। তাই স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলায় অসংখ্য বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি হয়। বরিশাল জেলায় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলো ছিল বেশ তৎপর। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের শুরুতে ভারতে যে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার প্রভাব বরিশাল জেলাকেও প্রভাবিত করে। এ জেলাতে খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন এবং মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে বরিশাল জেলা ও জেলার বাইরে বিভিন্ন স্থানে বরিশালের জনগণের অংশগ্রহণ ছিল প্রণিধানযোগ্য যা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জন অবিভক্ত বাংলার ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মালদা জেলাকে চীফ কমিশনারশাসিত আসামের সাথে সংযুক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। এ নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা এবং এর আয়তন ছিল ১০৬৫৪০ বর্গমাইল। এ সময় পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩১ মিলিয়ন। এর মধ্যে ১৮ মিলিয়ন মুসলমান, ১২ মিলিয়ন হিন্দু এবং ১ মিলিয়ন ছিল অন্যান্য। অন্যদিকে একই সময়ে পশ্চিম বাংলার আয়তন ছিল ১৪১৫৮০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৫৪ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৪২ মিলিয়ন হিন্দু এবং ৯০ লক্ষ ছিল মুসলমান এবং ৩০ লক্ষ ছিল অন্যান্য। তবে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবাবলি প্রকাশিত হওয়ার পর হিন্দু ও মুসলমান সমাজে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কলকাতার প্রভাবশালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ১৯০৫ সালের ৭ আগষ্ট কলকাতা টাউন হলে ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিনটিকে রাখিবন্ধন দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর করার পর নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান এ পরিকল্পনার পক্ষ নেয়। সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গকে কার্যকর করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগ শুরু থেকেই বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। সমগ্র বাংলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেস স্বদেশি আন্দোলন আহ্বান করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য গ্রহণ করা। এ আন্দোলনের ফলে বাংলায় লোহা ও ইস্পাত ঢালাই কারখানা, সাবান, সিগারেট, দিয়াশলাই, কাপড়ের মিল এমনকি ঔষধ তৈরির কারখানা পর্যন্ত স্থাপিত হয়। এদিকে স্বদেশি আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও শুরু হয়। বয়কট আন্দোলন পরিচালনার জন্য বাংলার বিভিন্ন জেলায় কিছু কিছু সমিতি স্থাপিত হয়। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনে অতিরিক্ত ধর্মীয় আবরণ থাকায় এটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। দেখুন- কে, এম, মোহসীন, *"বঙ্গভঙ্গ"*, *বঙ্গভঙ্গ* (ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১), মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), পৃ. ১; A.K. Chowdhury, *The Independence of East Bengal A Historical Process* (Dhaka: Jatiya Grantha Kendra, 1984), p.৩; এ.টি.এম আতিকুর রহমান, *"বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান : একটি পর্যালোচনা "*, অর্জুন গোস্বামী (সম্পাদিত), *বঙ্গভঙ্গ* (কলকাতা: চয়নিকা, ২০০৫), পৃ. ৩০-৩৭; অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ১৪৬-১৫১।

২. Masayuki usuda, *Aswinikumar Datta's Role In The Political, Social And Cultural Life Of Bangal* (Calcutta: University of Calcutta, 1977), pp.182-183.; বঙ্গভঙ্গের কথা প্রচারিত হবার পর বরিশাল শহরে প্রবীণদের দলটি নেতৃসঙ্ঘ এবং যুবকদের দলটি কর্মিসঙ্ঘ নামে পরিচিতি লাভ করে। জনগণকে বঙ্গভঙ্গের অপকারিতা বুঝাবার জন্য অশ্বিনী কুমার তাঁর অনুরাগী কতিপয় যুবককে আদেশ দিয়েছিলেন যারা বরিশালের রাজপথে হাট-বাজারে বক্তৃতা করতেন। কর্মিসঙ্ঘ নামের এ দলটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন ডাক্তার নিশিকান্ত বসু। অশ্বিনীকুমার এ দলটির পরামর্শদাতা ছিলেন। অপরদিকে প্রবীণদের দলটি যা নেতৃসঙ্ঘ নামে পরিচিত অশ্বিনীকুমার তাদের সাথে সরাসরি কাজ করতেন। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত, উকিল হরনাথ ঘোষ, জমিদার উপেন্দ্রনাথ সেন, উকিল দীনবন্ধু সেন, উকিল রজনীকান্ত দাস, জমিদার কালিপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী, অশ্বিনীকুমার প্রমুখ ছিলেন এ দলের সদস্য। এদের পাঁচজন স্বাক্ষরিত একটি পুস্তিকা *অনুরোধপত্র* বরিশাল জেলার সর্বত্র প্রচারিত হয়। দেখুন-মো. মনিরুজ্জামান, *"স্বদেশী আন্দোলন ও অশ্বিনী কুমার দত্ত"*, স্থানীয় ইতিহাস. সংখ্যা ৯, রাজশাহী, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ১২৪-১২৫

৩. মো. মনিরুজ্জামান, *বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন ও অশ্বিনী কুমার দত্ত*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ (ঢাকা: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭), পৃ. ৯১-৯২

৪. মো. মনিরুজ্জামান, *"স্বদেশী আন্দোলন ও অশ্বিনী কুমার দত্ত"*, স্থানীয় ইতিহাস. সংখ্যা ৯, রাজশাহী, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ১৩৩-১৩৪

৫. হীরালাল দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭), পৃ. ৪২

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

৭. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস* (ঢাকা: আঞ্চলিক ইতিহাস ফাউন্ডেশন, ১৯৯০), পৃ. ৫৩৪

৮. হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৯. তপংকর চক্রবর্তী, *অশ্বিনী কুমার দত্ত* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮), পৃ. ৩২

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

১১. হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

১২. মামুন সিদ্দিকী, *"আবদুল রসুল: রাজনৈতিক ভূমিকা ও রাজনৈতিক চিন্তা"*, ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ, সংখ্যা ৫, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ২৫-২৬।

১৩. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *যে জাতি গঠনের পথে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথা*, অনুবাদ: নলিনীমোহন দাশগুপ্ত (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫), পৃ. ২৮৯

১৪. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

১৫. কমল চৌধুরী (সংকলিত ও সম্পাদিত), "১৯০৫ সালে বাংলা", *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫), পৃ. ৩৮৭

১৬. মো. মনিরুজ্জামান, *বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন ও অশ্বিনী কুমার দত্ত*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ (ঢাকা: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭), পৃ. ৯০

১৭. মামুন সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত।*

১৮. হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

১৯. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৫

২০. আনিসুর রহমান স্বপন, *"প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ এবং বরিশাল"*, *আনন্দ লিখন*, বরিশাল, মে, ১৯৯৮, পৃ. ৩-১০

২১. মোহাম্মদ আবদুল বাতেন চৌধুরী, *খান বাহাদুর হাশেম আলী খান: রাজনৈতিক জীবন এবং কর্ম*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ (ঢাকা: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১), পৃ. ১৫

২২. ডা. আব্দুল বারী, *অগ্নিযুগ ও সশস্ত্র সংগ্রাম* (মাদারীপুর : গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, ২০১২), পৃ. ১৬

২৩. *প্রাগুক্ত।*

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

২৬. ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৯০৫-১৯৪৭* (ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৮), পৃ. ৩০

২৭. ড. নুরুল ইসলাম মনজুর, *শতবর্ষ পরে ফিরে দেখা ইতিহাস বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম লীগ* (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০), পৃ. ৪৫

২৮. বরিশাল জেলার অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সদস্যদের নাম দেখুন: সিরাজ উদ্‌দীন আহ্‌মেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৫৮৪-৫৮৮

২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮১

৩০. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৮

৩১. মো. মনিরুজ্জামান শাহীন, *"বরিশালে বিপ্লবী আন্দোলন"*, ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ. সংখ্যা ২, ঢাকা, জুন ২০১৬, পৃ. ৯৭-৯৮

৩২. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৭

৩৩. ডা. আব্দুল বারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

৩৪. সিরাজ উদ্‌দীন আহ্‌মেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৯

৩৫. মো. মনিরুজ্জামান শাহীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯

৩৬. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৬-৫৩৮

৩৭. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন : ১৭০৭-১৯৪৭* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ১৮৭

৩৮. ড. মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, চতুর্থ প্রকাশ (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০০), পৃ. ৮০-৮৪

৩৯. সিরাজ উদ্‌দীন আহ্‌মেদ, *হাশেম আলী খান*, দ্বিতীয় প্রকাশ (ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৬২

৪০. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪০-৫৪১

৪১. সিরাজ উদ্‌দীন আহ্‌মেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৫৯০

৪২. দিলীপকুমার সাহা, *দক্ষিণ এশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী* (ঢাকা: সৌরভ প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ১৯৬; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬।

৪৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫-১৯৪৭), অষ্টম মুদ্রণ (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৯৬-৯৭

৪৪. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪১

৪৫. হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

৪৬. ১৯২১ সালের ১৩ মে পিরোজপুর ন্যাশনাল স্কুলের ১৪ জন ছাত্র এবং প্রধান শিক্ষক অনন্তপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও আরও কয়েকজন শিক্ষক গ্রেফতার হন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন : জীবন ঘোষ; বারীন রায়; সুবোধ দাস; বিনোদ দাস; শৈলেশ চক্রবর্তী; অমিয় দাস; বিমলা চন্দ্র; পুলিন সরকার; শৈলেন্দ্র ঘোষ; সুধীর দাস; রাজেন সেন; প্রধান শিক্ষক অনন্তপ্রসাদ সেনগুপ্ত; শিক্ষক নগেন্দ্রদাস এবং শিক্ষক বিপুল দাস। এ গ্রেফতারের প্রতিবাদে সমগ্র পিরোজপুরে হরতাল পালিত হয়। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

৪৭. হুমায়ূন রহমান, পিরোজপুর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (ঢাকা: নার্গিস প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৭৫

৪৮. হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

৪৯. *তদেব।*

৫০. সিরাজ উদ্‌দীন আহ্‌মেদ, *হাশেম আলী খান*, দ্বিতীয় প্রকাশ (ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৭২-৭৪

৫১. ডক্টর আবদুল কাদের, *চিরঞ্জীব হাসেম আলী খান* (বরিশাল : কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরি, ১৯৬৭), পৃ. ১৮

৫২. হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

৫৩. মনিরুজ্জামান শাহীন, *ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বরিশাল ১৯২০-১৯৪৭* (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৬), পৃ. ৮৮

৫৪. *তদেব।*

৫৫. সিরাজ উদ্‌দীন আহ্‌মেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৫৯৬

৫৬. সিকদার আবুল বাশার, *ঝালকাঠী জেলার ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮), পৃ. ১৭০-১৭২

৫৭. মনিরুজ্জামান শাহীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

৫৮. সিরাজ উদ্‌দীন আহ্‌মেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৬-৫৯৭

৫৯. *তদেব।*

৬০. হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪-৭৫

৬১. Masayuki usuda, *op.cit.,* pp. 360-361.

৬২. টি.এম.জালালউদ্দীন, *ঐতিহ্যবাহী বরিশাল* (বরিশাল: স্মৃতিপ্রকাশ, ২০০৩), পৃ. ৪৩

৬৩. হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

৬৪. *বরিশাল হিতৈষী*, বরিশাল, ২২ ভাদ্র, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

৬৫. হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

৬৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৭৪; ড. মো. মাহাবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৫

৬৭. Masayuki usuda, *Ibid.*

৬৮. হীরালাল দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

৬৯. *তদেব*, পৃ. ৭৯

৭০. মনিরুজ্জামান শাহীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০

৭১. *তদেব*, পৃ. ১০১

৭২. সিরাজ উদ্‌দীন আহ্‌মেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৭-৫৯৮